স্টাডি নোটস

প্রথম সেমিস্টার SEC পেপার

ড. সুদীপ্ত গাঙ্গুলী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ, নদিয়া

গান্ধর স্থাপত্য রীতি

ভারতের শিল্প-স্থাপত্যের ইতিহাসে খ্রিঃ পূঃ ৫০ থেকে ৫০০ খ্রিঃ পর্যন্ত এক বিশেষ গল্পরীতির বিকাশ ঘটে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে গান্ধার রাজ্যে গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণে এই শিল্পের উৎপত্তি ঘটে। রাজ্যের নাম অনুসারে এই শিল্পের নামকরণ হয় 'গান্ধর শিল্প' (Gandhara art)। এই শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- রোমান, গ্রিক ও ভারতীয় শিল্পরীতির সমন্বয়ে এই শিল্প গঠিত।
- চুন, বালি, পাথর, পোড়ামাটি, মাটি ও প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে মূর্তি নির্মাণের প্রবর্তন।
- গরুড়, যক্ষ ও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে গ্রিক দেবতা অ্যাপেলো, জিউস, ব্যাকারের প্রাণবন্ত, পেশিবহুল, কুতিকেশ মূর্তির অনুকরণ গান্ধার

শিল্পের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। গ্রিক শরীর সর্বস্বতার সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আশ্চর্যমিলন। ঘটেছিল এই শিল্পে।
- গান্ধার শিল্পে মূর্তি নির্মাণে সোনালি বা অন্য রংএর গাঢ় প্রলেপ দেওয়া হত এবং ক্ষেত্রবিশেষে মূর্তিতে গোঁফ লাগানো বা পাগড়ি পরানোর রীতি দেখা যায়।
- দামি অলংকার, উত্তরীয় ও প্রসাধনের ব্যবহারে এই শিল্প নতুন মাত্রা পেয়েছিল। পোশাকের ভাজ পর্যন্তও অনুকরণ করা হয়েছিল।
- শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল। মসৃণতা ও পুলিশের কাজ।
- বৌদ্ধমূর্তি নির্মাণে গান্ধার শিল্পের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। চিন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি স্থানে কনিষ্কের উদ্যোগে গান্ধার শিল্প জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পাল ও সেন স্থাপত্য রীতি

বাংলার সোমপুর, পাহাড়পুর, ওদন্তপুর, বিক্রমশীলা প্রভৃতি মহাবিহারের স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্প শিল্প-স্থাপত্যের অনন্য দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন বিহার ও মন্দির নির্মাণকৌশল তিবৃত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণভূমির শিল্পপ্রেমীরা অনুকরণ করে। বাস্তশিল্পে 'সর্বতোভদ্র' নামে একপ্রকার মন্দির নির্মাণ রীতির উল্লেখ আছে। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন "পাহাড়পুরের মন্দির প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ বিস্ময়। সকল সর্বতোভদ্র মন্দিরের পুরোভাগে এর অবস্থান দেখা যায়।"

স্থাপত্যের জগতে এটি উল্লেখ্য।

টেরাকোটা স্থাপত্য রীতি

পালযুগের 'টেরাকোটা শিল্প' (বা পাড়োমাটির মূর্তি ও সূক্ষ্ম কারুকার্যময় শিল্প) স্থাপত্য শিল্পের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বহন করে। বিখ্যাত দুই স্থাপত্যশিল্পী ছিলেন স্বীয় ও তার ছেলে বীতপাল। সমসাময়িক একটি লিপিতে সোমপুরী মহাবিহারের শিল্পরীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "জগতের নয়নের একমাত্র বিরামস্থল অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তু।" পালযুগে অষ্টধাতুর ও কালোপাথরের তৈরি দেবদেবীর মূর্তিগুলি সৃজনশীলতার পরিচয় দেয় মূল্যবান কষ্টিপাথরের তৈরি বহু মূর্তি পালদের ভাস্কর্যের সাক্ষ্য-বহন করে। বিভিন্ন ভঙ্গির নারীমূর্তি ও দেবদেবীর মূর্তি পোড়ামাটির ফলকে সুন্দরভাবে খোদাই করা আছে। সেনযুগে বহু খ্যাতনামা শিল্পীর উদ্ভব ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে বরেন্দ্রভূমির শূলপাণি উল্লেখ্য। অন্য শিল্পীদের মধ্যে কর্ণভদ্র, বিষ্ণুভদ, তথাগতসাগর, সুত্রধর প্রমুখের শিল্প প্রতিভা প্রশংসার দাবি রাখে। বল্লালসেনের 'বল্লালবাড়ি' স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

টেরাকোটা স্থাপত্য রীতি

পালযুগের 'টেরাকোটা শিল্প' (বা পাড়োমাটির মূর্তি ও সূক্ষ্ম কারুকার্যময় শিল্প) স্থাপত্য শিল্পের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বহন করে। বিখ্যাত দুই স্থাপত্যশিল্পী ছিলেন স্বীয় ও তার ছেলে বীতপাল। সমসাময়িক একটি লিপিতে সোমপুরী মহাবিহারের শিল্পরীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "জগতের নয়নের একমাত্র বিরামস্থল অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তু।" পালযুগে অষ্টধাতুর ও কালোপাথরের তৈরি দেবদেবীর মূর্তিগুলি সৃজনশীলতার পরিচয় দেয় মূল্যবান কষ্টিপাথরের তৈরি বহু মূর্তি পালদের ভাস্কর্যের সাক্ষা-বহন করে। বিভিন্ন ভঙ্গির নারীমূর্তি ও দেবদেবীর মূর্তি পোড়ামাটির ফলকে সুন্দরভাবে খোদাই করা আছে। সেনযুগে বহু খ্যাতনামা শিল্পীর উদ্ভব ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে বরেন্দ্রভূমির শূলপাণি উল্লেখ্য। অন্য শিল্পীদের মধ্যে কর্ণভদ্র, বিষ্ণুভদ, তথাগতসাগর, সুত্রধর প্রমুখের শিল্প প্রতিভা প্রশংসার দাবি রাখে। বল্লালসেনের 'বল্লালবাড়ি' স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পল্লব শিল্প রীতি

পল্লব রাজাদের আমলে প্রথমত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে ধর্মকেন্দ্রিকতা লক্ষ করা গেলেও অসম্ভব শৈল্পিক নৈপুণ্যে তা আজও চিরভাস্বর হয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত, সূক্ষ্ম কারুকার্যময় মন্দির স্থাপত্যই পল্লব শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়ত, পল্লব শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণের রীতি। ড. সরসীকুমার সরস্বতীর মতে, অমরাবতী শিল্পকলার প্রভাব পল্লব শিল্পের মধ্যে লক্ষ করা যায়। পল্লব শিল্পের ক্রমবিবর্তনের ধারা ধরে এই শিল্পকে মাটে চারটি শিল্পরীতিতে ভাগ করা যায়। যেমন— মহেন্দ্র শিল্পরীতি, মহামল্ল বা নরসিংহ শিল্পরীতি, রাজসিংহ বা দ্বিতীয় নরসিংহ শিল্পরীতি ও অপরাজিত শিল্পরীতি। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬২৫ খ্রিঃ) পাহাড় কেটে মন্দিরের রূপদানের কৌশল প্রথম আবিষ্কার করেন। পাহাড় কেটে সুন্দরভাবে বাঁকানো পিলার, চক্রাকার লিঙ্গম ও অসাধারণ কারুকার্যময় গোপুরম বা তোরণ তার সময় নির্মিত হয়। পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে 'একাম্বরনাথ মন্দির', 'মুক্তেশ্বর মন্দির', 'বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির', 'ঐরাবতেশ্বর মন্দির, 'ত্রিপুরান্তকেশ্বর মন্দির', 'মামল্লপুরমের মন্দির, মহাবলীপুরমের সপ্তরথের

মন্দির' (সপ্ত পাগোড়া পাঁচটি রথ পঞ্চপাণ্ডবের নামে এবং দ্রৌপদী ও গণেশ রথ মন্দির) ও কারি কৈলাসনাথের মন্দির' উল্লেখ্য। অধ্যাপক ড. নগেন্দ্রনাথ ঘোষ শেষ মন্দিরদ্বয় সম্পর্কে বলেন 'the Pallava art is more evalued and more elaborate"।

পল্লব শিল্প রীতি

পল্লব রাজাদের আমলে প্রথমত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে ধর্মকেন্দ্রিকতা লক্ষ করা গেলেও অসম্ভব শৈল্পিক নৈপুণ্যে তা আজও চিরভাস্বর হয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত, সূক্ষ্ম কারুকার্যময় মন্দির স্থাপত্যই পল্লব শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়ত, পল্লব শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণের রীতি। ড. সরসীকুমার সরস্বতীর মতে, অমরাবতী শিল্পকলার প্রভাব পল্লব শিল্পের মধ্যে লক্ষ করা যায়। পল্লব শিল্পের ক্রমবিবর্তনের ধারা ধরে এই শিল্পকে মাটে চারটি শিল্পরীতিতে ভাগ করা যায়। যেমন— মহেন্দ্র শিল্পরীতি, মহামল্ল বা নরসিংহ শিল্পরীতি, রাজসিংহ বা দ্বিতীয় নরসিংহ শিল্পরীতি ও অপরাজিত শিল্পরীতি। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬২৫ খ্রিঃ) পাহাড় কেটে মন্দিরের রূপদানের কৌশল প্রথম আবিষ্কার করেন। পাহাড় কেটে সুন্দরভাবে বাঁকানো পিলার, চক্রাকার লিঙ্গম ও অসাধারণ কারুকার্যময় গোপুরম বা তোরণ তার সময় নির্মিত হয়। পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে 'একাম্বরনাথ মন্দির', 'মুক্তেশ্বর মন্দির', 'বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির', 'ঐরাবতেশ্বর মন্দির, 'ত্রিপুরান্তকেশ্বর মন্দির', 'মামল্লপুরমের মন্দির, মহাবলীপুরমের সপ্তরথের

মন্দির' (সপ্ত পাগোড়া পাঁচটি রথ পঞ্চপাণ্ডবের নামে এবং দ্রৌপদী ও গণেশ রথ মন্দির) ও কারি কৈলাসনাথের মন্দির' উল্লেখ্য। অধ্যাপক ড. নগেন্দ্রনাথ ঘোষ শেষ মন্দিরদ্বয় সম্পর্কে বলেন 'the Pallava art is more evalued and more elaborate"।

চোল ও দ্রাবিড় শিল্প রীতি

কালিঙ্গ থুপারনি', 'জীবক চিন্তামণি' ইত্যাদি গ্রন্থে চোল শিল্পের বহু তথ্য রয়েছে। স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে চোলদের অসামান্য অবদান ছিল। 'দ্রাবিড় শিল্পরীতি'তে গেল স্থাপত্য নিদর্শনগুলি তৈরি হয়েছিল। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ইলারোর কৈলার্স মন্দির যা রাষ্ট্রকুটরাজ প্রথম কৃষ্ণের (৭৫৮-৭৭২) তৈরি। সুবর্ণভূমির শৈলেন্দ্র-রাজা শ্রীবিজয় রাজরাজ চোলের অনুমতিক্রমে নেগাপত্তমে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম দিকে চোল রাজারা ক্ষুদ্রাকৃতির মন্দির তৈরি করলেও পরবর্তীকালে বিশালাকৃতির মন্দির তৈরি করে। সুক্ষ্ম কারুকার্যময় বৃহদাকার তারেণ বা 'গোপুরম' বা প্রবেশদ্বার চোল শিল্পের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। কুম্ভকোনমের গোপুরমটি স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চোল শিল্পের বিখ্যাত নিদর্শনগুলির মধ্যে চোলরাজ বিজয়ালয়ের 'চোলেশ্বর মন্দির', প্রথম পরান্তকের 'করনাথের মন্দির', প্রথম বাজরাজের তাঞ্জোরের 'রাজরাজেশ্বরের মন্দির', প্রথম রাজেন্দ্র চোলের 'গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমের মন্দির', 'সুব্রাহ্মণ্য মন্দির' ও 'দ্বারসমুদ্রের মন্দির' ইত্যাদি।

এছাড়া চালুক্য রাজাদের এলিফ্যান্টা দ্বীপের মন্দির স্থাপত্য উল্লেখযোগ্য। বল্লাল সেনের রাজশাহির দেওপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির, গঙ্গরাজ অনন্তদেব চোড়গঙ্গার (১০৭৮-১১৫০) পুরীর জগন্নাথ মন্দির, গঙ্গরাজ প্রথম নরসিংহের (১২৩৮-১২৬৪) কোনারকের সূর্যমন্দির, লিঙ্গরাজ মন্দির, মুক্তেশ্বর মন্দির তৈরি হয় উত্তর ভারতের নাগররীতি'তে। সর্যমন্দিরকে দূর থেকে কৃষ্ণবর্ণের মতো দেখতে বলে একে 'কৃষ্ণ প্যাগোডা'বলে। আবুপাহাড়ে শ্বেতপাথরের জৈনমন্দির ও মধ্যপ্রদেশের চান্দেল্লরাজ প্রথম বঙ্গ (৯৫৪-১,০০২) ও পরবর্তী রাজাদের চেষ্টায় ১১৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খাজুরাহোর ত্রিশটি মন্দির তৈরি হয়।

চোল ও দ্রাবিড় শিল্প রীতি

কালিঙ্গ থুপারনি', 'জীবক চিন্তামণি' ইত্যাদি গ্রন্থে চোল শিল্পের বহু তথ্য রয়েছে। স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে চোলদের অসামান্য অবদান ছিল। 'দ্রাবিড় শিল্পরীতি'তে গেল স্থাপত্য নিদর্শনগুলি তৈরি হয়েছিল। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ইলারোর কৈলার্স মন্দির যা রাষ্ট্রকুটরাজ প্রথম কৃষ্ণের (৭৫৮-৭৭২) তৈরি। সুবর্ণভূমির শৈলেন্দ্র-রাজা শ্রীবিজয় রাজরাজ চোলের অনুমতিক্রমে নেগাপত্তমে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম দিকে চোল রাজারা ক্ষুদ্রাকৃতির মন্দির তৈরি করলেও পরবর্তীকালে বিশালাকৃতির মন্দির তৈরি করে। সুক্ষ্ম কারুকার্যময় বৃহদাকার তারেণ বা 'গোপুরম' বা প্রবেশদ্বার চোল শিল্পের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। কুম্ভকোনমের গোপুরমটি স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চোল শিল্পের বিখ্যাত নিদর্শনগুলির মধ্যে চোলরাজ বিজয়ালয়ের 'চোলেশ্বর মন্দির', প্রথম পরান্তকের 'করনাথের মন্দির', প্রথম বাজরাজের তাঞ্জোরের 'রাজরাজেশ্বরের মন্দির', প্রথম রাজেন্দ্র চোলের 'গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমের মন্দির', 'সুব্রাহ্মণ্য মন্দির' ও 'দ্বারসমুদ্রের মন্দির' ইত্যাদি।

এছাড়া চালুক্য রাজাদের এলিফ্যান্টা দ্বীপের মন্দির স্থাপত্য উল্লেখযোগ্য। বল্লাল সেনের রাজশাহির দেওপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির, গঙ্গরাজ অনন্তদেব চোড়গঙ্গোর (১০৭৮১১৫০) পুরীর জগন্নাথ মন্দির, গঙ্গরাজ প্রথম নরসিংহের (১২৩৮-১২৬৪) কোনারকের সূর্যমন্দির, লিঙ্গরাজ মন্দির, মুক্তেশ্বর মন্দির তৈরি হয় উত্তর ভারতের নাগররীতি'তে। সর্যমন্দিরকে দূর থেকে কৃষ্ণবর্ণের মতো দেখতে বলে একে 'কৃষ্ণ প্যাগোডা'বলে। আবুপাহাড়ে শ্বেতপাথরের জৈনমন্দির ও মধ্যপ্রদেশের চান্দেল্লরাজ প্রথম বঙ্গ (৯৫৪-১,০০২) ও পরবর্তী রাজাদের চেষ্টায় ১১৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খাজুরাহোর ত্রিশটি মন্দির তৈরি হয়।

ভারতের গুহা চিত্র ও মন্দির চিত্র

ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস শুরু হয়েছে উচ্চপুরাপ্রস্তর উপপর্ব হতে। আদমগড়, মোরহনা প্রভৃতি স্থানের গুহাগাত্রে বা শিলাশ্রয়ের দেয়ালে অঙ্কিত নরনারী ও জীবজন্তুর ছবিগুলিই ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীনতম নিদর্শন। ভীমবেটকার কতিপয় গুহাচিত্রও এ পর্যায়ের। মধ্যপ্রস্তর বা ক্ষুদ্রাশ্মীয় ও নবপ্রস্তর যুগের চিত্রকলার নিদর্শনও বিরল নয়। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কুপগল, মাসকি, পিকলিহাল প্রভৃতি স্থানের পর্বতগাত্রে রচিত চিত্রাবলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক পর্বের উল্লেখ্য চিত্রভাণ্ডারের মধ্যে রয়েছে ছত্তীসগঢ়ের রামগড় পাহাড়ের যোগিমারা গুহা (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় প্রথম শতক), অজন্টার প্রথম, দ্বিতীয়, নবম, দশম, ষোড়শ, সপ্তদশ এবং ঊনবিংশ গুহা (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হতে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ) এলোরার ইন্দ্রসভা গুহা, বাঘের হাতিখানা ও রঙমহল গুহা, নাতামলৈর বিজয়ালয় চোলেশ্বর মন্দির ও তঞ্জাবূরের বৃহদীশ্বর মন্দির। পালপর্বে প্রথম মহীপালের সময় হতে রামপালের রাজত্বকাল পর্যন্ত এক শতকেরও অধিককাল ধরে পুঁথিকে আশ্রয় করে বিহার ও বাংলায় এক মনোগ্রাহী চিত্ররীতি গড়ে ওঠে। রঙ ও রেখার সুষম ব্যবহারে এই চিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।

পালপর্বের পুঁথিচিত্রে প্রতিভাত হয়েছে গুপ্ত মার্গ রীতির আদর্শ ও মানস। বস্তুত গুপ্ত বাকাটক পর্বেই ভারতীয় চিত্রকলা তার ফুল্ল, কুসুমিত রূপ লাভ

করে। এ পর্বের ছবিগুলি মুখ্যত গৌতম বুদ্ধের জন্ম - জন্মান্তরের কাহিনিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও শিল্পীর তুলিতে ফুটে উঠেছে সমাজের সামগ্রিক চিত্র ; একদিকে যেমন প্রদর্শিত হয়েছে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য অপরদিকে তেমনি ঘোষিত হয়েছে রূপ, রস ও গন্ধে ভরা দৃশ্যমান জগতের মহিমা। তবে সৌষ্ঠব মাধুর্যের চিহ্নমাত্র নেই বা ছন্দহীন নকশায় পরিণত হয়েছে এমন চিত্রও প্রাচীন ভারতে অঙ্কিত হয়েছে। ইতিহাসের উপাদানরূপে ভারতীয় চিত্রকলার এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। অজন্টার প্রথম গুহায় অঙ্কিত একটি ছবিতে দেখা যায়, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১১-৪২ খ্রিস্টাব্দ) ইরানের সমকালীন নরপতি দ্বিতীয় পরভেজ খুসরুর দূতকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছেন। সমুন্নত চিত্রকলার হয়তো এটি কোনও নিদর্শন নয় কিন্তু তৎকালীন ভারতের এক মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলরূপে এই ছবিখানি অশেষ তাৎপর্য বহন করছে। পালনৃপতি রামপালের (১০৭২-১১২৬ খ্রিস্টাব্দ) ৫৩ রাজাবর্ষে অনুলিখিত ও অঙ্কিত চিত্রসম্বলিত একটি পুঁথি' নতুন দিল্লির জাতীয় সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। পালরাজ যে অন্তত ৫৩ বছর রাজত্ব করেন তা এই পুথিচিত্রে প্রমাণিত। পালপর্বের সিংহভাগ পাণ্ডুলিপিই মহাযান, বজ্রযান ও তন্ত্রযান ধর্মসম্মত দেব - দেবীদের প্রতিকৃতি - শোভিত। সমকালীন বাংলা - বিহারের ধর্মীয় ইতিহাস তথা বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তার অকাট্য স্বাক্ষর এই পুঁথিচিত্র।

অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্র

অজন্তা ও ইলোরা গুহাচিত্র

প্রায় দুই হাজার বছরেরও বেশি আগে নির্মিত অজন্তা ও ইলোরা গুহাসমূহ কেবল অনন্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, এগুলি ভারতের প্রাচীন সমৃদ্ধির একমাত্র সংরক্ষিত নিদর্শন। অজন্তা ও ইলোরা গুহায় আঁকা ছবিগুলো এখনো পর্যন্ত টিকে থাকা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার সবচেয়ে শৈল্পিক নমুনা হিসেবে বিবেচিত হয়। অজন্তা এবং ইলোরা মূলত দুটি আলাদা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা। এরমধ্যে অজন্তা গুহাসমূহ ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের আওরঙ্গবাদ জেলার অজন্তা গ্রামের পাশেই পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক থেকে ৭ম শতকের মধ্যে অজন্তার ওয়াগোরা নদীর ২৫০ ফুট উঁচু গভীর খাড়া গিরিখাতের পাথর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছিল। ১৮১৯ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ব্রিটিশ সেনা অফিসার জন স্মিথ জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে গিয়ে অজন্তা গুহার সন্ধান পান। অজন্তায় রয়েছে ৩০টি গুহা যেগুলো প্রধানত তীর্থস্থান ও বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মৌর্য আমলে তৈরিকৃত এ

গুহাগুলোর মধ্যে পাঁচটি চৈত্যগৃহ এবং বাকিগুলো বৌদ্ধবিহার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। গুহাগুলোতে শিল্পীরা রীতিমত পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে গুহার দেয়ালে ফুটিয়ে তোলেন তাঁদের শিল্পকর্ম যা মানব সভ্যতার শিল্পকলার ইতিহাসের এক অনন্য সম্পদে পরিণত হয়। এতে তুলে ধরা হয়েছে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের জীবনকাহিনি, গবেষকরা মনে করেন বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক এই চিত্রকর্মগুলো পরবর্তীতে ভারতীয় চিত্রকলাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। অজন্তার গুহাগুলোতে ধর্মীয় নিদর্শন ছাড়াও সেই সময়কালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ, পশুপাখি, সাধারণ জনজীবন, রাজ দরবার ও অতীতের বর্ণনা পাওয়া যায়।

অজন্তায় গুহাচিত্রের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের গুহাচিত্রের পদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। পাহাড় কেটে কিভাবে এই মন্দিরগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল তা আজও স্থাপত্যজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বড় বিস্ময়। ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হরিসেনার রাজত্বের অবসান হলে মন্দিরগুলো ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়। বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যায় এই অতুল কীর্তি। অরণ্য গ্রাস করে নেয় পুরো এলাকা। বিরল গুহা চিত্রের জন্য অজন্তা ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

স্থাপত্যশৈলী, নির্মাণ প্রভৃতির কারণে আলাদা হওয়া সত্ত্বেও অজন্তা-ইলোরা একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। অজন্তা গুহা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরেই অবস্থিত প্রাচীন ভারতের আরেক অনন্য সৌন্দর্যময় প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ইলোরা গুহা।

মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গবাদ শহর থেকে ৩০ কিমি উত্তরে অবস্থিত ইলোরা গুহাসমূহ ভক্তক, ত্রৈকুটক, কালাচুরি, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও যাদব রাজবংশের সময়ে তৈরি করা হয়। চরনন্দ্রী পাহাড় কেটে ইলোরা গুহা মন্দিরগুলো তৈরি করা হয়েছিল। ইলোরাতে রয়েছে প্রচুর স্মৃতিসংবলিত ১০০ টি গুহার সারি, যার মধ্যে ৩৪ টি গুহা সবচেয়ে বিখ্যাত এদের স্থাপনার জন্য। গ্রানাইড পাথরের এই পাহাড়ের ৩৪টি গুহার মধ্যে ১৭টি হিন্দু ধর্মের, ১২টি বৌদ্ধ ধর্মের এবং ৫টি জৈন ধর্মের মন্দির রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর গুহাটির নাম কৈলাসনাথ মন্দির যেটি একটি হিন্দু গুহা, দেখতে অনেকটা বহুতল মন্দিরের মত, একটিমাত্র পাথরকে কেটে এটি তৈরি করা হয়েছিল। এই গুহায় বহু হিন্দু দেবতা এবং পৌরাণিক মূর্তি খোদাই করা আছে। অষ্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটদের রাজত্বকালে এই মন্দিরটি নির্মান করে হিন্দু দেবতা শিবের নামে উত্সর্গ করা

মৌর্য উত্তর যুগে (কুষান আমলে) ইন্দো-রোমান স্থাপত্য বা গান্ধার স্থাপত্য

মৌর্যত্তর যুগে ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিপুল অগ্রগতির সময়ে গ্রিক রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গান্ধার শিল্প বিকাশ লাভ করে। এই শিল্পরীতির নমুনা মূলত গান্ধার অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হওয়ায় এই শিল্পরীতিকে 'গান্ধার শিল্প' বলে। বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করে গ্রীক-প্রভাবিত এই শিল্পরীতির বিদেশী আঙ্গিক এক অপূর্ব শিল্পসুষমা লাভ করেছিল যদিও ভারতীয়রা তা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি। গান্ধার শিল্পে বুদ্ধমূর্তির অবয়ব গঠনে গ্রীক শিল্পশৈলীর অনুকরণ দেখা গেলেও ভারতীয় ভাবাদর্শ এর মর্মবস্তু ছিল। ঐতিহাসিকের ভাষায়, 'গান্ধার শিল্পীর হাত ছিল গ্রীকের কিন্তু হৃদয় ছিল ভারতীয়' (The Gandhara artist had the hand

of a Greek but the heart of and Indian Dr. Majumder)

গান্ধার শিল্পে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মানুষের যথার্থ প্রতিকৃতি নির্মাণ করার কৌশল ছিল এই শিল্পরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই শিল্পরীতিতে ভগবান বুদ্ধের মূর্তিগুলি গ্রীক দেবতা এপোলের মত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। শকদের আমলে এই শিল্পের সূচনা হয় তবে কুষাণ যুগে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গান্ধার শিল্প পূর্ণ বিকশিত চরিত্র ধারণ করে। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) শহরটি গান্ধার শিল্প-শৈলীতে বিশেষভাবে সজ্জিত হয়েছিল। গান্ধার শিল্পরীতি ভারতের অন্তর্দেশে প্রবেশ করতে না পারলেও এই শিল্পরীতির প্রভাব মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পরীতিতে দেখা যায়। সমালোচকদের মতে গান্ধার শিল্পরীতি ছিল অনেকটা যান্ত্রিক, বৈচিত্র্যহীন। আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এই মত পোষণ করেন যে, গান্ধার শিল্পের পাশাপাশি সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পরীতির মান কোনো অংশেই কম ছিল না। তথাপি এই শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পরীতিতে নতুন আঙ্গিকের সংযোজন ঘটিয়েছিল।

ভৌগোলিক দিক থেকে গান্ধার শিল্পের উৎপত্তি ছিল গান্ধার অর্থাৎ পেশোয়ার এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অর্থাৎ নগরহর, বামিয়ান, বেগ্রাম, সোয়াট উপত্যকা, ইউসুফজাই এলাকা এবং তক্ষশিলা। খ্রিস্টপূর্ব ৫০ অব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই শিল্পের ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল। গান্ধার শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম। মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী কুষাণ শাসকদের আমলে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও গ্রিক শিল্পরীতির সমন্বয়ে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব ঘটে

গান্ধার শিল্পের বৈশিষ্ট্য

(i) গ্রিক ও রোমান রীতিতে বুদ্ধ মূর্তি নির্মিত হত। গ্রিক শিল্পরীতি অনুযায়ী বুদ্ধের মূর্তিতে মাংসপেশি, উন্নত গ্রিবা ও পৌরুষ ফুটিয়ে তোলা হত। আর এর সঙ্গে চোখ ও মুখমণ্ডলে ভারতীয় কমনীয়তা বজায় রাখা হত। মূর্তিগুলিতে রঙের প্রলেপ, পালিশ প্রভৃতি ছাড়াও গোঁফ লাগানো ও পাগড়ি পরানো হত।

(ii) এই শিল্পে বুদ্ধ মূর্তির মস্তকে বাস্তবতা এবং বিমূর্ত বা অপ্রকাশিত ভাবের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

(iii) মূর্তি নির্মাণে পাথর, চুন, বালি, প্লাস্টার অফ প্যারিস, পোড়ামাটি ও মাটি ব্যবহার করা হত।

মথুরা শিল্পকলা

গন্ধার শিল্পের সমসাময়িক একটি শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল মথুরায়। সমৃদ্ধিশালী নগরী হিসাবে মথুরার খ্যাতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিরাজমান ছিল। কতকগুলি বাণিজ্যপথের সংযোগস্থল হওয়ায় অর্থনৈতিক দিক থেকে মথুরা ছিল সমৃদ্ধ। ফলে শিল্পেরও সেখানে বিকাশ ঘটেছিল অভাবনীয়ভাবে। মথুরা ভাস্কর্য শিল্প বিকশিত হয়েছিল কুষাণ আমলে। মথুরা ছাড়াও এই শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে পার্শ্ববর্তী সারনাথ, সাহেত মাহেত (শ্রাবস্তী) এবং কোসাম (কৌশাম্বী)এ। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের সময় থেকেই মথুরার শিল্পীদের অভাবনীয় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গন্ধারের ন্যায় মথুরা ভাস্কর্য শিল্পেও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের বিষয়টি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মথুরার সমস্ত ভাস্কর্যগুলি নির্মিত হয়েছিল সিক্রি থেকে আনা লাল চুনাপাথরের দ্বারা। কুষাণ সমাজ ও সংস্কৃতি মথুরায় প্রাপ্ত বিভিন্ন মূর্তিগুলির ভাস্কর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে হলে এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই সারনাথ যাদুঘরে রাখা কণিষ্কের রাজত্বের প্রথমদিকে নির্মিত দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব মুর্তিটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মূর্তিটির উচ্চতা দশ ফুট এবং প্রশস্ত তিন ফুট। এই মুর্তিটিতে শাক্যমুনি বা বুদ্ধের পা দুটি দৃঢ়ভাবে রক্ষিত বা দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়। তার ডান হাত অভয় মুদ্রায় স্কন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত, বাম হাতটি নিতম্বের ওপর স্থাপিত এবং শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের পোশাক ঐ হাত দিয়েই ধরা আছে। ডান স্কন্ধ আবরণহীন, মুর্তিটির দু'পায়ের মাঝখানে একটি সিংহ মূর্তি দেখা যায়। এই সিংহমূর্তিটি শাক্য সিংহের প্রতীক বলে এবিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন।

ওপরে উল্লেখিত বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলি ছাড়াও সাধারণভাবে মথুরা ভাস্কর্য শিল্পের বোধিসত্ত্ব মূর্তির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মূর্তিগুলির অঙ্গ সৌষ্ঠবে পার্থিব শক্তির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় বিশেষভাবে। অপার্থিব কোনো ধারণা এগুলির মধ্যে অনুপস্থিত। মুর্তিগুলির পরিচয় দিলেই তা স্পষ্ট

হয়ে উঠবে। প্রতেকটি মূর্তি দণ্ডায়মান। সাধারণভাবে এগুলি গোলাকার সমস্ত মূর্তিগুলি সামনাসামনি অবস্থিত। মূর্তিগুলি মস্তক মুণ্ডিত ও গুম্ফহীন। এগুলির কপালে কোনো ওড়না নেই। উর্ধ্বাঙ্গ অংশত আবৃত। ডান হাত অভয়মুদ্রায় উত্থান ভঙ্গিতে অবস্থিত এবং বাম হাত উরুর ওপরে রাখা। বক্ষ সামনের দিকে প্রলম্বিত, স্কন্ধগুলি প্রশস্ত, যা অফুরন্ত উৎসাহ ও শক্তির ইঙ্গিত দেয়। সর্বোপরি, চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত এবং স্মিত হাসিসম্পন্ন মুখ।

বৌদ্ধ ধর্মই কেবল মথুরা শিল্পের ওপর প্রভাব ফেলেনি জৈন ধর্মেরও অদ্ভুত কিছুটা প্রভাব পড়েছিল এর ওপর। বেশ কিছু নগ্ন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহাবীর ছাড়াও ঋষভ, সম্ভবনাথ, নন্দীবিসল - র মূর্তি এ - প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। এই মূর্তিগুলির কয়েকটি আবার চতুর্মুখবিশিষ্ট। আকার ও আয়তনের দিক থেকে এগুলি প্রায় বুদ্ধমূর্তিরই অনুরূপ।

ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ও এতে স্থান পেয়েছিল। নারীমূর্তি নির্মাণ ও তার রূপকল্পনাকে তুলে ধরতে মথুরার শিল্পীরা ছিল বেশ পারদর্শী। মূর্তিগুলির রূপকল্পনায় নারীদেহের যৌন আবেদন বেশ স্পষ্ট। মূর্তিগুলিতে একদিকে যেমন লাবণ্য ও নমনীয়তা স্থান পেয়েছে অপর দিকে তেমনি কামনার আবেদনও বিরাজমান। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে কোনো বিহার বা মন্দিরের ধনী পৃষ্ঠপোষকরাও বিবেচিত হয়েছিলেন। তাঁদের মূর্তিগুলি থেকে এই ধারণা লাভ করা সম্ভব। এছাড়া কুষাণ শাসকদ্বয়, যথা— বিম কদফিস ও কণিষ্ক এবং পশ্চিমী শক শাসক চস্টনেরও মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

অমরাবতী (বেঙ্গি) শিল্পকলা

সাতবাহন আমলের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত সে যুগের অপূর্ব শিল্পকলা। বিন্ধ্য পরবর্তী অঞ্চলে, বিশেষ করে কৃষ্ণা গোদাবরী ব - দ্বীপ এলাকায় জগয্যপেটা, অমরাবতী, নাগার্জুনকোন্ডা, গোলি প্রভৃতি এলাকায় দাক্ষিণাত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থাপত্য ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি থেকে এ - বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে অমরাবতী ছিল এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এই কারণে এটি অমরাবতী শিল্প এবং প্রাচীনকালে কৃষ্ণ - গোদাবরী সংলগ্ন এলাকাটি বেঙ্গি নামে পরিচিত থাকায় তা বেঙ্গিশিল্প নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। এই শিল্পের আনুমানিক সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ৪০০ অব্দ পর্যন্ত। যেহেতু সাতবাহনদের শাসনকাল উক্ত সময়কালের মধ্যেই পড়ে সেহেতু সাতবাহনদের শিল্প সংস্কৃতির

অগ্রগতি বোঝার জন্য তা আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বেঙ্গি বা অমরাবতী শিল্পকলার উদয় হলেও তার প্রাণবন্ত রূপ সঞ্জীবিত হয়েছিল সাতবাহন আমলে, বিশেষ করে খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। এই সময় শিল্প বিকাশের পিছনে অবশ্য কিছু অনুকূল পরিস্থিতি কাজ করেছিল। এর মধ্যে প্রধান বিষয় হল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, যার অন্যতম উৎস ছিল বাণিজ্য। পরবর্তী অধ্যায়ে পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান সী গ্রন্থের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে যে এই সময় দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলির সঙ্গে রোম তথা পাশ্চাত্যের বাণিজ্য চলত। দাক্ষিণাত্যের উপকূল সংলগ্ন কয়েকটি এলাকায় বেশ কিছু পরিমাণে রোমান মুদ্রা প্রাপ্তি এই মতকে দৃঢ়তর করে। শুধু বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি নয়, রাজ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরাও ধর্মীয় পুণ্যলাভের আশায় এই শিল্প সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই সমস্ত বিষয়গুলি সাতবাহন আমলে দাক্ষিণাত্যে শিল্প সৃষ্টির উপযুক্ত প্রেক্ষাপট রচনায় সাহায্য করে এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে মুক্ত এখানকার শিল্পী তথা ভাস্কররা স্বাধীনভাবে স্থাপত্য - ভাস্কর্য শিল্প সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন।

বস্তুত, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে সাতবাহন যুগের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম সে যুগে দাক্ষিণাত্যে প্রসারিত হওয়ায় শিল্পের মধ্যে ঐ ধর্মের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল। পশ্চিম ও পূর্ব দক্ষিণাত্য উভয় এলাকাতেই শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের মধ্যে কার্লে এবং পূর্ব দাক্ষিণাত্যের মধ্যে অমরাবতী সাতবাহন আমলের শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। পাথর কেটে চৈত্য ও বিহার নির্মাণের ক্ষেত্রে সাতবাহনরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অমরাবতীর শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অন্তত দুজন সাতবাহন শাসক যথা— বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি ও যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি যুক্ত ছিলেন। তবে সাতবাহনদের কিছুকাল আগেই অমরাবতীতে স্তূপ নির্মাণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। সাতবাহন আমলে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা নতুনভাবে নির্মিত হয়। এছাড়াও অমরাবতীতে কিছু নরনারীর মূর্তি পাওয়া গেছে, যেগুলির শিল্পশৈলী ছিল উন্নত। এখানের শিল্পে প্রকৃতির পরিবর্তে মানুষকে স্থাপন করা হয়েছিল।

আলোচ্য সময়কালে আর্যাবর্ত তথা বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরাংশে গন্ধার ও মথুরা শিল্পের ন্যায় অমরাবতী শিল্পকলারও মূল বিষয়বস্তু ছিল বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধদেব ও তাঁর জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অমরাবতীর শিল্পীরা নানা ভাস্কর্যের সৃষ্টি ঘটিয়েছিলেন। নরনারীর মূর্তিকল্পনায় এখানের

গুপ্ত যুগের চিত্রকলা

চিত্রকলার ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কালিদাসের রঘুবংশম্, মেঘদূতম্ ও মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এ ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় চিত্রশালার

উল্লেখ আছে। গুপ্ত যুগে চিত্রশালা ছিল সংগীতশালার অংশ। সংগীতশালাতে অসংখ্য চিত্র সাজিয়ে রাখা হত। রঘুবংশম্ ও মেঘদূতম্ কাব্যে বসতবাটি ও রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে চিত্রাঙ্কনের কথা বলা হয়েছে।

অজন্তার গুহাগাত্রে গুপ্ত চিত্রকলার অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ করা যায়। অজন্তার মোট ত্রিশটি গুহার মধ্যে পাঁচটি গুহা গুপ্ত যুগের চিত্রকলা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ১৬ এবং ১৭ নং গুহার কয়েকটি চিত্র অসাধারণ।

অজন্তার গুহাচিত্রের মূল গুহাচিত্র বিষয়বস্তু বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং জাতকের কাহিনি হলেও এগুলিতে গরুড়, যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, পশুপাখি, নদী, ফুল, রাজা, রাজদরবার, ঋষি, বন, নগর, সাধারণ নর-নারী— সবই স্থান পেয়েছে।

১নং গুহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর কালিদাসের রচনায় উল্লেখ পদ্মপাণির চিত্রটি অসাধারণ। মূর্তিটির ডান হাতে শ্বেতপদ্ম এবং মাথায় মণিমুক্তাখচিত মুকুট। মুখমণ্ডল বেদনাহত এবং দৃষ্টি অবনত।

কেবলমাত্র ধর্মীয় ভাবনাই নয়— পার্থিব বিষয়বস্তুও স্থান পেয়েছে অজন্তার চিত্রে। গদিতে শায়িতা নারী, অশ্বপৃষ্ঠে রাজা, মুমূর্ষু রাজকন্যা, রাজদরবারে পারসিক দূতের আগমন— সবই স্থান পেয়েছে অজন্তার চিত্রাবলীতে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ অজন্তা চিত্রাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বাঘ ও মালবের গুহাচিত্রগুলিতে অজন্তার শিল্পশৈলীর প্রবহমানতা লক্ষ করা যায়। নর-নারীর সুখ-দুঃখ এবং হাসি-কান্নার বাস্তব চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

গুহাচিত্র অঙ্কনের জন্য গুহাগাত্রে একটি পটভূমি তৈরি করা হত। কাদা, গোবর, পাথরের গুঁড়ো এবং কখনও ধানের তুষ মিশিয়ে গুহার গায়ে একটি পুরু আস্তরণ দেওয়া হত। তার উপর দেওয়া হত পাতলা চুনের প্রলেপ। এই প্রলেপ ভিজে থাকতেই এর উপর বিভিন্ন রং আলতোভাবে পালিশ করা হত।

ভীমবেটকার ম্যুরাল চিত্রকলা

ম্যুরাল হল একটি চিত্রকলা, যা দেওয়াল, ছাদ বা অন্যান্য স্থায়ী পৃষ্ঠতলগুলিতে আঁকা হয় বা সরাসরি প্রয়োগ করা হয়। ম্যুরাল চিত্রকলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রদত্ত স্থানটির স্থাপত্য উপাদানগুলি সাদৃশ্যপূর্ণভাবে ছবিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিছু দেওয়াল চিত্র বড় ক্যানভাসে আঁকা হয়, তারপর সেগুলি দেওয়ালে সংযুক্ত করা হয়।

প্রাচীন ভারতে এই শিল্পকলার বিকাশ হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক কালে ভীমবেটকা গুহাতে। ২০০৩ সালে ইউনেস্কো ভীমবেটকা গুহাকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে ঘোষণা করে। প্রতিবেদন এ বলা হয়, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের নথিতে এই স্থানটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ

মঠ হিসাবে। তারা এই তথ্য সংগ্রহ করেছিল স্থানীয় আদিবাসীদের কাছ থেকে।

ভীমবেটকা গুহাতে আঁকা চিত্রের বিষয়গুলো প্রাচীনকালে অংকিত অন্য যেকোনো গুহাচিত্রের চেয়ে বেশ সমৃদ্ধ। এই গুহার প্রাচীরগুলোতে শুধু একটি বিষয়েই নয়, বরং বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আঁকা হয়েছে। এখানে মানুষের প্রতীকী অবয়ব থেকে শুরু করে শিকারের দৃশ্য, ধর্মীয় চিহ্নসহ অনেক বিষয়ই স্থান পেয়েছে।

চিত্রগুলোকে বোঝার সুবিধার্থে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন— মানুষের অবয়ব (নর-নারী), প্রাণী (বিভিন্ন প্রজাতির), শিকারের দৃশ্য, রণসংগীত, নৃত্যানুষ্ঠান, পৌরাণিক কাহিনী এবং বিভিন্ন নকশার মাধ্যমে অলংকারিক সাজসজ্জা।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ মথপালের মতে, এখানে প্রাপ্ত মানুষের অবয়বের এর সংখ্যা ২,৩৩০ এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত; যেমন— পুরুষ, মহিলা, ছেলে, মেয়ে, শিশু, মানুষের প্রতীকি অবয়ব, শিকারি, ঘোড়া চালক, হাতি চালক, ষাড় চালক, সৈন্য, বাদ্যযন্ত্র বাদক, কুঠার হাতে মানুষ, বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যস্ত মানুষ, আচার-অনুষ্ঠান এবং মা দেবী।

এসব চিত্রে পুরুষের সংখ্যা ২০৭৬, নারী ৭১, ছেলে ২৪, মেয়ে ২, শিশু ৬ এবং ১৫১টি খন্ডিত অবয়ব। এখানে মানুষের ছবির চেয়ে বিভিন্ন পশুপাখির ছবি কম, ১৩৭৭টি। চিত্রিত পশুপাখির মধ্যে আছে সিংহ, বাঘ, চিতা, গন্ডার, বন্যমহিষ, ষাড়, গরু, বাইসন, নেকড়ে, ছাগল, পেচা, বন্য শূকর ইত্যাদি।

তবে এ থেকে একটি বিষয় ধারণা করা যেতে পারে যে, প্রাচীন এই জাতিগোষ্ঠী পশুপাখির পাশাপাশি নিজেদেরও অনেক গুরুত্ব দিয়েছিল চিত্রিত করার ক্ষেত্রে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। আমরা যদি ভীমবেটকা গুহাতে মনুষ্য অবয়বের সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে- পুরুষের অবয়বের সংখ্যা এখানে নারীদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই ধারণা করা যায়, প্রাচীন এই ভীমবেটকা গুহার পরিবারগুলো যে পিতৃপ্রধান প্রধান ছিল তা বলা যেতেই পারে।

ভীমবেটকা গুহাতে অনেক ধরনের কম্পোজিশনের ছবি আছে। তারা শিকার, যুদ্ধ, নৃত্য, পারিবারিক জীবন চিত্রিত করেছে। ২০টি শিকারের দৃশ্য পাওয়া যায়, যেখানে ২৮৫টি আছে মানুষের অবয়ব। তবে একটি বিষয় অবাক করার মতো। সেখানে ৯টি নারী-অবয়বও ছিল যাদের শিকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।